

## সৃষ্টি-তত্ত্ব।

ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টি। সৃষ্টিলীলা অনাদি। ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই জগতের সৃষ্টিকর্তা। “জন্মান্তর যতঃ” ইত্যাদি বেদান্তসূত্র, “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং “জন্মান্তর যতোহ্ময়াং” ইত্যাদি শ্রীমদ্-ভাগবতোক্তি ( ১।১।১ ) তাহার প্রমাণ। সৃষ্টিলীলার আদি নাই; অনাদিকাল হইতেই সৃষ্টিপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, আবার মহাপ্রলয়ে তাহার ধ্বংস হয়; আবার সৃষ্টি হয়—এইরূপ।

লীলাবশতঃ সৃষ্টি। “লোকবত্ত্বে লীলাকৈবল্যম্—বেদান্তসূত্র । ২।১।৩৩।” কেবল লীলাবশেই সৃষ্টিকার্য্যে ভগবানের প্রবৃত্তি হইয়াছে, কোনওরূপ ফলাভিসন্ধান বা প্রয়োজনের বশে নহে। তিনি আপ্তকাম, তিনি পরিপূর্ণ-স্বরূপ; তাঁহার কোনও অভাব বা প্রয়োজন থাকিতে পারেনা। সুখোন্মত্ত ব্যক্তি যেমন সুখের উদ্দেশ্যে বশতঃই নৃত্যাদি করিয়া থাকে, তদ্রূপ স্বরূপানন্দ-স্বভাব-বশতঃই ভগবান্ অগ্ন্যাগ্ন লীলার দ্বারা সৃষ্টিলীলাও করিয়া থাকেন। “সৃষ্টাদিকং হরিনৈব প্রয়োজনমপেক্ষা তু কুরুতে, কেবলানন্দাদ্ যথা মত্তস্ত নর্ভনম্। গোবিন্দভাষ্য। ২।১।৩৩।”

লীলায় করুণা। যাহা হউক, ভগবান্ লীলারস-রসিক বলিয়া লীলাই তাঁহার স্বভাব; আবার তিনি পরম-করুণ বলিয়া জীবাদির প্রতি করুণা-প্রকাশও তাঁহার স্বভাব; এই করুণাবশতঃই “লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব” হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক আনন্দ-রসাবেশে তিনি যে সমস্ত লীলা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত লীলা হইতেই আনুশঙ্গিক ভাবে তাঁহার করুণাও প্রকাশিত হইয়া থাকে—করুণা-প্রকাশ-বিষয়ে তাঁহার অন্তঃকান না থাকিলেও ইহা হইয়া থাকে; কারণ, করুণা তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বিলাস-বিশেষ; লীলাও স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি; তাই—যেখানেই প্রজ্জলিত অগ্নি, সেখানেই যেমন আলোক থাকিবে, তদ্রূপ—যেখানে স্বরূপ-শক্তির বিকাশ, সেখানেই করুণা থাকিবে; তাই ভগবানের যে কোনও লীলাতেই আনুশঙ্গিক ভাবে করুণার অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু সৃষ্টিলীলাতে কাহার প্রতি কিরূপে করুণা প্রদর্শিত হইল? করুণা প্রদর্শিত হইয়াছে—বহির্গুণ জীবের প্রতি।

পঞ্চনিত্যবস্ত্ত। সৃষ্টিলীলায় জীবের প্রতি করুণা। কাল, কৰ্ম্ম, মায়া, জীব ও ঈশ্বর—এই পাঁচটা বস্ত্ত নিত্য—অনাদি। ইহা স্বীকার না করিলে সকল বিষয়েই অনবস্থা-দোষ জন্মিবে। ব্যাসদেব ধ্যান-নেত্রে এই পাঁচটা অনাদি-তত্ত্বের দর্শনও পাইয়াছিলেন। এই পাঁচটা নিত্যবস্ত্তর মধ্যে কাল, কৰ্ম্ম ও মায়া এই তিনটা অদৃষ্ট-অচেতন; আর ঈশ্বর চিদ্বস্ত্ত, বিভূ-চিৎ; জীব অণুচিত, চিৎকণ। যাহা হউক, এই অনাদি কৰ্ম্ম বা অদৃষ্ট বশতঃ কতকগুলি জীব শ্রীকৃষ্ণ-বহির্গুণ হইয়া ভগবৎ-সেবা-সুখের নিমিত্ত লালসায়িত না হইয়া মায়িক জগতের সুখভোগের নিমিত্ত অনাদি কাল হইতে লালসায়িত হইল। তাহাদের এই অদৃষ্টের নিবৃত্তি না হইলে শ্রীকৃষ্ণগুণতা অসম্ভব, সুতরাং তাহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসেবা-সুখ-লাভও অসম্ভব। কিন্তু সাধারণতঃ ভোগব্যতীত অদৃষ্টের নিবৃত্তিও সম্ভব নহে, আবার ভোগায়তন-দেহ ব্যতীত অদৃষ্টের ভোগও সম্ভব নহে। অদৃষ্টজনিত মায়িক-সুখ-দুঃখ-ভোগের নিমিত্ত মায়িক বা প্রাকৃত ভোগায়তন দেহের প্রয়োজন; প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ব্যতীত মায়িক-ভোগায়তন-দেহ-প্রাপ্তিও ঐ সমস্ত জীবের পক্ষে অসম্ভব। ভগবান্ লীলাবশতঃ যখন মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন, তখনই ঐ সমস্ত জীব মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডে স্ব-স্ব-অদৃষ্টানুরূপ ভোগায়তন দেহকে আশ্রয় করিয়া কৰ্ম্মকল ভোগ করিবার সুযোগ পায় এবং মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডের দুঃখ-যন্ত্রণাদিতে উত্যক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-বহির্গুণতার বিষময় অল্পভব পূৰ্ব্বক কৃষ্ণগুণতা-লাভের এবং শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-লাভের উপযোগী সাধন-ভজনেরও সুযোগ পাইয়া জীব ধন হইতে পারে। সৃষ্ট-ব্রহ্মাণ্ডে এই সমস্ত সুযোগই জীবের প্রতি ভগবানের করুণার পরিচায়ক। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়—ভগবানের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে সৃষ্টিকার্য্যে ভগবানের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকিলেও, বহির্গুণ জীবের দিক্ দিয়া বিচার করিলে একটা

বিশেষ উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়—সেই উদ্দেশ্যটাই হইতেছে জীবের অদৃষ্ট-ভোগ। ইহা অবশ্য সৃষ্টিকর্তা ভগবানের সঙ্কলিত উদ্দেশ্য নহে—তাহার স্বরূপাত্মবন্ধি কারুণ্যের বিকাশে আপনা-আপনিই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে; আমরা—বহির্গত জীব আমরা—তাই মনে করি, আমাদের অদৃষ্ট-ভোগের নিমিত্তই পরম-করণ ভগবান্ বৈচিত্রীময় জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। “এতিভূতানি ভূতান্মাহাভূতৈর্মহাভুজ। সসর্জোচ্চবচাচ্চাঃ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে ॥ শ্রীভা, ১১।৩.৩ ॥—নবযোগেন্দ্রের একতম অন্তরীক্ষ নিমি-মহারাজকে বলিলেন—হে মহাভুজ, সর্বভূতান্মাহাভুতপুরুষ এসমস্ত মহাভূতদ্বারা, স্বীয় অংশভূত জীবের বিষয়ভোগের জ্ঞাত এবং মুক্তির জ্ঞাত, দেবতিথ্যাগাদি ভূতসকলের সৃষ্টি করিয়াছেন। বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামস্বজং প্রভুঃ। মাত্রার্থক ভবার্থক আত্মনে কল্পনায় চ ॥ ১০।৮।১২।—প্রভু পরমেশ্বর জীবদিগের বিষয়-ভোগের নিমিত্ত, ভববন্ধহেতু কৰ্মাদিকরণের নিমিত্ত এবং ভগবানে সমর্পণের নিমিত্ত বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের সৃষ্টি করিলেন।”

**সৃষ্টিবিষয়ে সাংখ্যমত।** এখানে বলা হইল, ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা; কিন্তু সাংখ্যদর্শন বলেন—প্রকৃতিই জগতের সৃষ্টির কারণ; (পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি নিত্য বস্তুর অন্ততম যে মায়া, তাহারই অপর নাম প্রকৃতি); জগতের উপাদান-কারণও প্রকৃতি, নিমিত্ত-কারণ বা কর্তাও প্রকৃতি। সব্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণের সমন্বয়েই প্রকৃতি বা মায়া। পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা অনন্ত রকমের জিনিস দেখিতে পাই, তাহাদের পরিদৃশ্যমান উপাদানও অনন্ত রকমের; কিন্তু একই প্রকৃতি কিরূপে এই অনন্ত রকমের বস্তুর অনন্ত রকম উপাদানে পরিণত হইল? ইহার উত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন—প্রকৃতি স্বতঃপরিণাম-শীলা; প্রকৃতি অচেতন জড়বস্তু হইলেও ইহার বস্তুগত বা স্বরূপগত ধর্মই এই যে, ইহা আপনা-আপনিই বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদান-রূপে পরিণত হইতে পারে এবং বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন আকারাদিতেও পরিণত হইতে পারে; সুতরাং বিভিন্ন আকারাদি দেওয়ার নিমিত্ত অপর কোনও কর্তা বা নিমিত্ত-কারণের প্রয়োজন হয় না; স্বতঃপরিণাম-শীলা বলিয়া প্রকৃতি যেমন উপাদান-কারণ হইতে পারে, তেমনি নিমিত্ত-কারণও হইতে পারে।

**জগতের কারণ ঈশ্বর।** শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ দার্শনিক পণ্ডিতগণ উপনিষদের প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছেন যে—জড় প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণও হইতে পারে না, নিমিত্ত-কারণও হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—“জগত-কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কুপা ॥ আদি মে পঃ।” ঈশ্বরই জগতের কারণ, ঈশ্বরের শক্তিতেই প্রকৃতি কারণরূপে পরিণত হয়—প্রকৃতি জড় বলিয়া নিজে স্বতন্ত্রভাবে কারণ হইতে পারে না।

**সাংখ্যমতের নিরসন।** সাংখ্যাচার্য্যগণ প্রকৃতির জগৎ-কারণত্বের যোগ্যতা দেখাইয়াছেন—তাহার স্বতঃ-পরিণামশীলতা স্বীকার করিয়া। প্রকৃতি স্বতঃ-পরিণামশীলা না হইলে জগতের কারণ হইতে পারিত না। সাংখ্যমত খণ্ডন করিতে যাইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যাহা বলেন, তাহার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে—প্রকৃতি জড় বা অচেতন বলিয়া স্বতঃ-পরিণামশীলা হইতে পারে না; এবং স্বতঃ-পরিণামশীলা না হইলে প্রকৃতি জগতের কারণও হইতে পারে না। কিন্তু জড় বলিয়া প্রকৃতি স্বতঃ-পরিণামশীলা হইতে পারে না কেন? প্রকৃতি যদি স্বতঃ-পরিণামশীলা হয়, তাহা হইলে এই পরিণামশীলতা হইবে তাহার বস্তুগত বা স্বরূপগত ধর্ম; স্বরূপগত ধর্ম কখনও স্বরূপকে ত্যাগ করে না; সুতরাং প্রকৃতির স্বতঃ-পরিণামশীলতাও কোনও সময়েই প্রকৃতিকে ত্যাগ করিবে না—সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই প্রকৃতি পরিণাম প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। তাহা হইলে মহাপ্রলয়ে সৃষ্ট-ব্রহ্মাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে যখন প্রকৃতির গুণত্রয় সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন এই সাম্যাবস্থাও বেশীকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না—প্রকৃতির পরিণামশীলতা-বশতঃ সাম্যাবস্থাও অল্প অবস্থায় অবিলম্বেই পরিণত হইবে। কিন্তু শাস্ত্র বলেন—পুনঃসৃষ্টির পূর্বপর্ধ্যন্ত সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়াই প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় অবস্থিত থাকে। ইহাতেই বুঝা যায়—পরিণামশীলতা প্রকৃতির স্বরূপগত ধর্ম নয়—প্রকৃতি স্বতঃ-পরিণামশীলা নয়; সুতরাং একই প্রকৃতি আপনা-আপনি জগতের পরিদৃশ্যমান অসংখ্য বস্তুর

পরিদৃশ্যমান অসংখ্য উপাদানে পরিণত হইতে পারে না—কাজেই জগতের উপাদান-কারণও হইতে পারে না। আবার স্বতঃ-পরিণাম-শীলতার অভাববশতঃ প্রকৃতি আপনা-আপনি পরিদৃশ্যমান বস্তু-সমূহের বিভিন্ন আকারেও পরিণত হইতে পারে না—সুতরাং জগতের নিমিত্ত-কারণও হইতে পারে না। অধিকন্তু, আমরা দেখিতে পাই—জগৎ অনন্ত বৈচিত্রীতে পরিপূর্ণ; বৈচিত্রী বিচার-বুদ্ধিরই ফল; অচেতন বস্তুর বিচার-বুদ্ধি থাকিতে পারে না; সুতরাং অচেতন প্রকৃতি বৈচিত্রীময় জগতের কর্তা বা নিমিত্ত-কারণও হইতে পারে না। ঈশ্বরই জগতের কারণ—নিমিত্ত-কারণও ঈশ্বর, উপাদান-কারণও ঈশ্বর। জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের ধর্ম বা তাহাদের কোনও একটীর প্রাধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং সৃষ্টিব্যাপারে প্রকৃতির সাহচর্য আছে সত্য; কিন্তু তাহা গোণ—তাই প্রকৃতিকে জগতের গোণ কারণ বলা যাইতে পারে। এসম্বন্ধে একটু আলোচনা বোম হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

গোণ-উপাদান-কারণ-রূপে প্রকৃতির যে অংশ পরিণত হইয়াছে, তাহাকে বলে গুণমায়া—ইহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা। আর যে অংশ গোণ-নিমিত্ত-কারণ-রূপে পরিণত হইয়াছে, তাহাকে বলে জীবমায়া—ইহা একটা শক্তি-বিশেষ; কিন্তু শক্তি হইলেও জড়-শক্তি,—চৈতন্যময়ী কোনও শক্তিকর্তৃক প্রবর্তিত না হইলে ক্রিয়াশীল হইতে পারে না।

ঈশ্বরের শক্তিই মুখ্য উপাদান-কারণ। গুণমায়া গোণ-উপাদান-কারণ। প্রকৃতি স্বতঃ-পরিণাম-শীল নয় বলিয়া জগতের বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদানরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা গুণমায়ার নাই। ঈশ্বরের শক্তি তাহাকে এই যোগ্যতা দান করে—অগ্নির শক্তিতে লৌহ যেমন দাহক হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে, তদ্রূপ ঈশ্বরের শক্তিতে ত্রিগুণাত্মিকা গুণমায়াও জগতের উপাদানরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। অগ্নির শক্তিব্যতীত লৌহ দাহ করিতে পারে না, পরন্তু লৌহের সাহচর্য ব্যতীতও অগ্নি দাহ করিতে পারে বলিয়া অগ্নিকেই যেমন দাহ-কার্যের মুখ্য কারণ বলা হয়; তদ্রূপ—ঈশ্বরের শক্তিব্যতীত গুণমায়া জগতের উপাদান হইতে পারে না, পরন্তু গুণমায়ার সাহচর্য ব্যতীতও ঈশ্বরের শক্তি উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে (ভগবদ্ধামাদির উপাদান একমাত্র ঈশ্বরের শক্তি—চিহ্নক্ৰি) বলিয়া ঈশ্বরের শক্তি বা ঈশ্বরই হইলেন জগতের মূল-উপাদান-কারণ। আর অগ্নির শক্তিতে লৌহও দাহ করিতে পারে বলিয়া অগ্নিকে যেমন দাহ-কার্যের গোণ কারণ বলা যাইতে পারে, তদ্রূপ ঈশ্বরের শক্তিতে গুণমায়াও জগতের উপাদান লাভ করে বলিয়া তাহাকে জগতের গোণ-উপাদান-কারণ বলা হয়।

ঈশ্বরের শক্তিই মুখ্য নিমিত্ত-কারণ। জীবমায়া গোণ নিমিত্ত-কারণ। আর জীবমায়া ঈশ্বরের শক্তিতে কৃষ্ণবহির্গুণ জীবগণের স্বরূপের জ্ঞান এবং স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্যের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া মায়িক বস্তুতে তাহাদের আসক্তি জন্মাইয়া দেয়; তাহাতে প্রাকৃত সুখভোগের লালসায় ভোগায়তন দেহ অঙ্গীকারপূর্বক তাহারা প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে আসিতে প্রলুব্ধ হয় এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে আসিয়া পড়ে; ইহাতেই ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবনিচয়ের সৃষ্টির আনুকূল্য সাধিত হয়। এইরূপে জীবমায়া দ্বারা সৃষ্টিকর্তার আনুকূল্য সাধিত হয় বলিয়া জীবমায়া হইল জগতের গোণ নিমিত্ত-কারণ; আর মুখ্য নিমিত্ত-কারণ হইলেন—ঈশ্বর বা ঈশ্বরের শক্তি।

মায়া ও জীব। বহির্গুণ জীব তাহার অনাদি-বহির্গুণতাবশতঃ অনাদিকাল হইতেই কৃষ্ণের দিকে পেছন ফিরিয়া আছে। তাই, কৃষ্ণই যে সুখস্বরূপ, সুখের একমাত্র উৎস, তাহা সে জানেনা। সে মুখ ফিরাইয়া আছে, মায়িক জগতের সুখসম্ভারের দিকে; তাই মনে করিয়াছে—মায়িক জগতেই তাহার চিরন্তনী সুখবাসনার চরমাতৃপ্তি লাভ হইতে পারিবে। এই ভ্রান্তবুদ্ধিবশতঃ সে মায়িক জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মায়ার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। “স যদজয়াত্মজামনুষ্যীত ॥ শ্রী, ভা, ১০।৮৭।৩৮ ॥ স তু জীবঃ যৎ যস্মাৎ অজয়া অবিজয়া অজাং মায়াং অনুষ্যীত আলিঙ্গ্যেত উপাধিলিপ্তো ভবেদিত্যর্থঃ। শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্তিকৃত টীকা।” মায়াও তখন যেন ঈর্ষার সহিতই (সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া মায়িক সুখভোগের জগৎ তোমার লোভ হইয়াছে! আচ্ছা, এস, মায়িক সুখের

যজ্ঞা কেমন, একবার চাখিয়া দেখ—এইরূপ ভাবের সহিতই) তাহাকে অঙ্গীকার করিয়া তাহার বৃত্তিকে যুগ্ম করিয়া, তাহার স্বরূপের স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া দিল। “পরঃ স্বচেতাসদগ্রাহঃ পুংসাং যন্মায়য়া কৃতঃ। বিমোহিতধিয়াঃ দৃষ্টস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥ ইত্যাদি শ্রী, ভা, ৭।৫।১১ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—পুংসাং ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ শ্রাদিত্যাদিরীত্যা অনাদিত এব ভগবদ্বিমুখানাং জীবানাম্। অতএব নুনং সের্ষায়া যন্ত ভগবতো মায়য়া মোহিতধিয়াং স্বরূপবিস্মরণপূর্বকদেহাত্মবুদ্ধ্যা বিশেষণ মোহিতবুদ্ধী-নামসতামিত্যাদি।” এসমস্ত দ্বারা বুঝা গেল—অনাদিবহির্গুণ জীব যখন মায়ার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তখনই মায়ার স্বীয় জীবমায়াংশে তাহার স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়াছে—যেন অনন্তচিন্তে কিছুকাল মায়িক সুখ ভোগ করিয়া সেই সুখের স্বরূপ—সেই সুখের অকিঞ্চিৎকরতা, অনিত্যতা, দুঃখসঙ্কুলতা উপলব্ধি করিতে পারে। বস্তুতঃ অমুভব ব্যতীত বিষয়ের—মায়িক সুখদুঃখের তীক্ষ্ণতা জানা যায় না। “নানুভূয় ন জানাতি পুমান্ বিষয়তীক্ষ্ণতাম্। নির্বিজ্ঞতে স্বয়ং তস্মান্ ন তথা ভিন্নবীঃ পরৈঃ॥ শ্রী, ভা, ৩।৫।৪১॥” মায়িক সুখদুঃখের তীক্ষ্ণতা অনুভব করিলেই নির্বেদ অবস্থা জন্মিবার এবং তাহার পরে ভগবদ্বিমুখতা জন্মিবারও সম্ভাবনা হয়। বস্তুতঃ অনাদি-বহির্গুণ জীবের বিষয়-ভোগ-লালসার তীব্রতা প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যেই ভগবদাসী মায়ার তাহাকে বিষয় ভোগ করাইয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে অশেষ যন্ত্রণাও দেয়—যেন দুঃখসঙ্কুল সংসার-সুখের প্রতি ব্রাস্ত জীবের বিতৃষ্ণা জন্মে, যেন নিত্যসুখের উৎস শ্রীভগবানে তাহার উন্মুখতা জন্মে।

**পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ।** প্রসঙ্গক্রমে পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ সম্বন্ধে দু’একটা কথা বলা যাউক। উপনিষৎ বলেন “সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম। ছা, ৩।১৪॥—যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই ব্রহ্ম।” বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—ব্রহ্ম সশক্তিক মূল-তত্ত্ব এবং সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য আশ্রয়-তত্ত্ব; সূত্রাং ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু কোথাও থাকা সম্ভব নহে, সমস্তই স্বরূপতঃ ব্রহ্মই; বিশেষতঃ, ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের শক্তি এবং প্রকৃতিই যখন জগতের কারণ এবং প্রকৃতিও যখন ব্রহ্মেরই (বহিরঙ্গ) শক্তি, তখন অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মের শক্তিই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পরে অমুপ্রবিষ্ট। মায়াক্রিয়াতে অমুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মই স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন (১।৪।৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহাকেই পরিণামবাদ বলা হয়। আর যাহারা ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন না, শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ সেই সমস্ত আচার্য্যগণ বলেন—ব্রহ্ম যখন নিঃশক্তিক, তখন তাহা দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য সম্ভব নহে; বস্তুতঃ এই জগতের কোনও অস্তিত্বই নাই; যে স্থানে কোনও বস্তুই নাই, ঐন্দ্রজালিক যেমন সে স্থানেও দর্শকগণকে বিচিত্র বস্তু দেখাইয়া থাকে, তদ্রূপ মায়ার আমাদিগকে এই জগৎ-প্রপঞ্চ দেখাইতেছে; ইহা মায়াবিজুত। ঐন্দ্রজালিকের কৌশলে দর্শকগণ যাহা কিছু দেখে, তাহা যেমন ভ্রান্তিমাত্র, তদ্রূপ মায়ার প্ররোচনায় জগৎ বলিয়া আমরা যাহা কিছু দেখি, তাহাও ভ্রান্তিমাত্র; জীবের পরিদৃশ্যমান দেহাদিও ভ্রান্তিমাত্র। ইহাকেই বিবর্তবাদ বলে (বিবর্ত অর্থ ভ্রান্তি)। মায়ার প্রভাব অন্তর্হিত হইলেই অমুভব হইবে যে,—সমস্তই ব্রহ্ম, তদ্ব্যতীত অণু কোনও বস্তুই নাই, জীব তখন বুঝিতে পারিবে—সেও ব্রহ্ম। তাহারা আরও বলেন,—ব্রহ্ম নির্বিকার; সূত্রাং ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইতে পারেন না, হইলে তিনি বিকারী হইয়া পড়েন। ইহার উত্তরে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—পরিদৃশ্যমান জগৎ ভ্রান্তিমাত্র নহে, ইহার অস্তিত্ব আছে, তবে ইহা নশ্বর; আর ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তিনি জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও অবিকারী থাকিতে পারেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার না করিলেই বিবর্তবাদের কথা তুলিতে হয়; কিন্তু বিবর্তবাদে অনেক সমস্যারই সমাধান হয় না; বিশেষতঃ বিবর্তবাদ স্থাপন করিতে গেলে যে মায়ার অবতারণা করিতে হয়, শক্তি স্বীকার না করিলে সেই মায়ারও কোনও সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া যায় না। জগতেও নানাবিধ শক্তির ক্রিয়া অনবরত প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে; ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার না করিলে এই সমস্ত শক্তিরও মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহা হউক, এখানে এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনার স্থানাভাব। প্রস্তারিত বিষয় আরম্ভ করা যাউক। (১।৭।১১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।



**কাল ও কর্মের সহায়তা।** পাঁচটি অনাদি তত্ত্বের মধ্যে ঈশ্বর, জীব ও মায়া বা প্রকৃতি যে সৃষ্টিকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন, তাহাই এপর্যন্ত বলা হইল। ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, প্রকৃতি তাহারই শক্তিতে তাহার সহায়তা করে, আর জীব সৃষ্ট বস্তুর ভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট ভোগায়তন-এহাদি অঙ্গীকার করিয়া সৃষ্টি-ব্যাপারকে সফল করিতে চেষ্টা করে। অগ্নি দুইটি অনাদি তত্ত্বও—কাল এবং কর্ম বা অদৃষ্টও—সৃষ্টি-ব্যাপারে উপেক্ষণীয় নহে; তাহারাও সৃষ্টির সহায়তা করিয়া থাকে। কাল এবং কর্ম বা অদৃষ্ট জড়—অচেতন; সুতরাং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু করিতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বর-শক্তি দ্বারা প্রবর্তিত হইয়া তাহারাও সৃষ্টিকার্যের সহায়তা করে। এতদ্ব্যতীত আর একটি বস্তু আছে—সৃষ্টি-ব্যাপার বুঝিবার পক্ষে যাহার জ্ঞান একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। এই বস্তুটি হইতেছে—প্রকৃতির স্বভাব।

**প্রকৃতির স্বভাব।** অল্পযোগে দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়, কিন্তু ক্ষীর বা স্নেহে পরিণত হয় না; ইহা দুগ্ধের স্বভাব। অল্প পরে আমরা দেখিতে পাইব—প্রকৃতি পরিণতি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ মহত্ত্বে তার পরে অহঙ্কার-তত্ত্ব, তার পরে তন্মাত্রা-ইত্যাদিতে পরিণত হয়; কিন্তু প্রথমতঃ মহত্ত্বে পরিণত না হইয়া অহঙ্কার-তত্ত্ব বা তন্মাত্রাদিতে পরিণত হয় না—ইহা প্রকৃতির স্বভাব।

**কালের সহায়তা।** আবার অল্পযোগে দধিতে পরিণত হওয়া দুগ্ধের স্বভাব হইলেও অল্পযোগ করা মাত্রই ইহা দধিতে পরিণত হয় না—কিছু সময়ের অপেক্ষা করে; সুতরাং সময় বা কালও দধিতে পরিণতির নিমিত্ত দুগ্ধের সহায়তা করে। তদ্রূপ ঈশ্বর-শক্তিতে প্রকৃতির বিকার-প্রাপ্তি-যোগাতা জন্মিলেও সময় বা কালের আনুকূল্য অপরিহার্য—সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতি মহত্ত্বে, মহত্ত্ব অহঙ্কারে, অহঙ্কার-তত্ত্ব তন্মাত্রাদিতে পরিণত হইতে কিছু সময়ের অপেক্ষা করে; সুতরাং সময় বা কালও প্রকৃতির পরিণতির বা সৃষ্টিকার্যের আনুকূল্য করিয়া থাকে।

**অদৃষ্টের সহায়তা।** তারপর অদৃষ্টের কথা। পূর্বে বলা হইয়াছে, লৌকিক-দৃষ্টিতে সৃষ্টি-ব্যাপারের উদ্দেশ্য—জীবের অদৃষ্ট-ভোগ; সুতরাং সৃষ্টি-নিমিত্ত প্রকৃতির পরিণাম এবং সৃষ্টবস্তু—সমস্তই অদৃষ্ট-ভোগের অনুকূল হইবে। ঈশ্বরশক্তি-কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়া কর্ম বা অদৃষ্টই প্রকৃতির পরিণামকে, অথবা সৃষ্টবস্তুকে এই আনুকূল্য দান করে—অথবা ঈশ্বর-শক্তিই জীবাদৃষ্টের অনুকূল-ভাবে প্রকৃতিকে পরিণাম প্রাপ্ত করাইয়া থাকে; সুতরাং প্রকৃতিকে পরিণামপ্রাপ্ত করাইবার পক্ষে অরূপতা যোগাইয়া জীবাদৃষ্ট ঈশ্বর-শক্তির সহায়তা করিয়া থাকে।

যাহা হউক, প্রকৃতি (এবং প্রকৃতির স্বভাব), কাল, কর্ম এবং জীবকে লইয়া ঈশ্বর কিরূপে সৃষ্টিকার্য নির্বাহ করিয়া থাকেন, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

**পুরুষ কর্তৃক প্রকৃতিতে শক্তির সঞ্চার ও প্রকৃতির পরিণতি। মহত্ত্ব।** সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ (ঈশ্বর) দূর হইতে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাতে শক্তি-সঞ্চার করেন; এই শক্তি-সঞ্চারের ফলে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হয়। এই বিক্ষোভিতা-প্রকৃতিতে পুরুষ তখন জীবরূপ-বোধ্যমান করেন অর্থাৎ স্ব-স্ব-কর্মকল সহ যে সমস্ত জীব মহাপ্রলয়ে সূক্ষ্মরূপে পুরুষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছিল, পুরুষ সে সমস্ত জীবকে তাহাদের কর্মকল সহ বিক্ষোভিতা প্রকৃতিতে নিক্ষেপ করিলেন। তখন পুরুষ-কর্তৃকই প্রবর্তিত হইয়া কাল ও কর্ম এবং প্রকৃতির স্বভাব প্রকৃতিকে যথাযথ পরিণাম প্রাপ্ত করাইতে লাগিল। এইরূপে জীবাদৃষ্টের অনুকূল প্রথম যে পরিণাম প্রকৃতি লাভ করে, তাহাকে বলে মহত্ত্ব (শ্রীভা ২।৫২১-২২)। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতেই মহত্ত্বের উদ্ভব; সুতরাং মহত্ত্বও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ থাকিবেই; তিনটি গুণ থাকিলেও কাল-কর্ম-স্বভাবাদির প্রভাবে মহত্ত্বে সত্ত্ব ও রজোগুণেরই প্রাধান্য; সত্ত্বের ধর্ম জ্ঞান-শক্তি এবং রজঃ-এর গুণ ক্রিয়াশক্তি; সুতরাং মহত্ত্ব ক্রিয়া-জ্ঞান-শক্তিময় একটা উপাদানবিশেষ। (শ্রী, ভা, ২।৫২৩)।

**অহঙ্কার।** কাল-কর্মাদির প্রভাবে মহত্ত্ব হইতে আবার এক তত্ত্বের উদ্ভব হইল—ইহার নাম অহঙ্কার; অহঙ্কার-তত্ত্ব তমোগুণেরই প্রাধান্য—সত্ত্ব ও রজোগুণের অল্পতা। এই অহঙ্কার-তত্ত্ব আবার বিকার-প্রাপ্ত হইয়া তিন রূপে অভিব্যক্ত হয়—সাত্বিক অহঙ্কার, রাজস অহঙ্কার এবং তামস অহঙ্কার।

তামসাহকারের লক্ষণ দ্রব্যশক্তি, রাজস-অহকারের লক্ষণ ক্রিয়াশক্তি এবং সাত্বিকাহকারের লক্ষণ জ্ঞানশক্তি ( শ্রীভা-২।৫।২৩-২৪ ) ।

বস্তুতঃ কাল-কর্মাতির প্রভাবে সাম্যাবস্থাপন্ন গুণত্রয় যখন পরিণতি প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহার এক অংশে সত্ত্বগুণের, এক অংশে রজো গুণের এবং এক অংশে তমোগুণের প্রাধান্য জন্মে । যে অংশে সত্ত্ব-গুণের এবং যে অংশে রজোগুণের প্রাধান্য জন্মে, সেই দুই অংশকে মহত্ত্ব বলে ; যে অংশে রজোগুণের প্রাধান্য, সেই অংশকে সূত্রতত্ত্বও বলে ; সূত্রতত্ত্ব মহত্ত্বেরই প্রকার-ভেদ । আর যে অংশে তমোগুণের প্রাধান্য, তাহাকে বলে অহকার-তত্ত্ব । অহকার-তত্ত্বে তমোগুণই বেশী, সত্ত্ব ও রজোগুণ অল্প । এই অহকার-তত্ত্ব আবার বিকার প্রাপ্ত হইয়া তিনরূপে অভিব্যক্ত হয়—সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহকার । তামসিক অহকারের লক্ষণ দ্রব্যশক্তি, অর্থাৎ ইহাতে মহাভূতাদি দ্রব্য-উৎপাদনের সামর্থ্য আছে ; রাজস-অহকারের লক্ষণ ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ ইহাতে ক্রিয়া-সাধন-ইন্দ্রিয়াদি উৎপাদনের শক্তি আছে ; আর সাত্বিক অহকারের লক্ষণ জ্ঞানশক্তি অর্থাৎ ইহাতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবতাবিষয়ক সামর্থ্য আছে ।

**তামসাহকারের বিকার ।** তামসাহকার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে শব্দগুণযুক্ত আকাশ উৎপন্ন হয় ; আকাশ বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে স্পর্শগুণযুক্ত বায়ু উৎপন্ন হয় । আকাশ হইতে বায়ুর উদ্ভব বলিয়া বায়ুতে আকাশের গুণ শব্দও থাকে ; সূত্রাং বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ—এই দুইটি গুণই আছে । এই বায়ু হইতেই প্রাণ ( দেহ ধারণ-সামর্থ্য ), ওজঃ ( ইন্দ্রিয়ের পটুতা ), সহঃ ( মনের পটুতা ) এবং বল ( শরীরের পটুতা ) জন্মিয়া থাকে । যাহা হউক, ঈশ্বরাদিষ্ঠিত কাল, কর্ম ও স্বভাব বশতঃ ঐ বায়ু যখন বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা হইতে তেজ উৎপন্ন হয় ; তেজের স্বাভাবিক গুণ রূপ । বায়ু হইতে ইহার উদ্ভব হওয়ায় ইহাতে শব্দ এবং স্পর্শ গুণও আছে ; এইরূপে তেজের গুণ তিনটি—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ । এই তেজ বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে জল উৎপন্ন হয় ; জলের গুণ রস । তেজ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহাতে তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ এবং রূপও আছে ; এইরূপে জলের চারিটি গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস । জল বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে ক্ষিতি ( মাটি ) উৎপন্ন হয় ; ক্ষিতির গুণ গন্ধ । জল হইতে উৎপন্ন বলিয়া ক্ষিতিতে জলের গুণ-চতুষ্টয়ও আছে ; এইরূপে ক্ষিতির গুণ হইল পাঁচটি—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ । ( শ্রীভাঃ ২।৫।২৫-২৬ । )

**পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত ।** এইরূপে দ্রব্যশক্তিসম্পন্ন তামসাহকার-তত্ত্ব হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ—এই পাঁচটি তন্মাত্র এবং এই পঞ্চতন্মাত্রের স্থূলরূপ বা আশ্রয়—যথাক্রমে আকাশ, বায়ু তেজ, জল এবং ক্ষিতি—এই পাঁচটি মহাভূত—সাকল্যে দশটি বস্তুর উৎপত্তি হয় । এস্থলে যে আকাশাদি পঞ্চ-মহাভূতের কথা বলা হইল, ইহার পরিদৃশ্যমান আকাশাদি নহে—পরন্তু পরিদৃশ্যমান আকাশাদির সূক্ষ্ম উপাদান মাত্র ।

**সাত্বিকাহকারের বিকার মন ও দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ।** সাত্বিকাহকার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে মন ( অর্থাৎ মনের উপাদান ) এবং মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রের ( ঈশ্বরাদীন শক্তি-বিশেষের ) উৎপত্তি হয় । এই সাত্বিকাহকার হইতেই পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দশটি দেবতার উদ্ভব হয় । এই সমস্ত অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণ ঈশ্বরাদীন শক্তি-বিশেষ—তত্ত্ব-ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকরী-শক্তিদাতা ; প্রাকৃত দেহের চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের নিজস্ব কোনও শক্তি নাই ; মৃতদেহের শক্তি-হীন ইন্দ্রিয়াদিই তাহার প্রমাণ । ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণের শক্তিতেই চক্ষু-কর্ণাদি স্ব-স্ব-কার্য্য নির্বাহে শক্তিমান হয় । এই অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণ ঈশ্বর-শক্তি হইলেও ভোগায়তন-প্রাকৃত দেহকে কর্মফল-ভোগের উপযোগী করিবার নিমিত্ত প্রাকৃত-সাত্বিকাহকার-যোগে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে । ( শ্রীভা-২।৫।৩০ । )

**রাজসাহকারের বিকার দশ ইন্দ্রিয় ।** রাজসাহকার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের ( অর্থাৎ তাহাদের সূক্ষ্ম উপাদানের ) উৎপত্তি হয় ( শ্রীভা-২।৫।৩১ । )

বিকার-সমূহের মিলনের অসামর্থ্য। শব্দ-স্পর্শাদি পাঁচটি বস্তুই ভোগের বিষয়; তাহাদের আশ্রয়রূপে তাহাদের স্থূলরূপ-আকাশাদিও ভোগ্য বস্তু; তাহাদের পরস্পর মিলনেই উপভোগ্য রসের বৈচিত্রী জন্মিতে পারে। ঈশ্বরাধিষ্ঠিত অদৃষ্টের প্রেরণায় কালবশে প্রকৃতি শব্দ-স্পর্শাদিতে এবং তাহাদের আশ্রয়রূপ আকাশাদিতে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু তাহারা পৃথক্ ভাবেই অবস্থান করিতেছিল; কারণ, জীবাদৃষ্টান্তরূপ বিচিত্র ভোগ্য বস্তুর উৎপাদনের অল্পকূলভাবে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হওয়ার যোগ্যতা তাহাদের তখনও ছিল না। আর যে দশ-ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের অধিপতিরূপ একাদশ ইন্দ্রিয় মনের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা যখন স্ব-স্ব-অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার শক্তিতে শক্তিমান হয়, তখনই তাহারা শব্দ-স্পর্শাদি উপভোগের করণ-রূপে যোগ্যতা লাভ করিতে পারে; কিন্তু অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার শক্তি লাভের পূর্বে, অদৃষ্টান্তরূপ কোনও ভোগ্যতন-দেহে তাহাদের সমাবেশ এবং স্থূলরূপে অভিব্যক্তি—অদৃষ্ট-ভোগের পক্ষে অপরিহার্য্য। কিন্তু ভোগ্যতন-দেহের উপাদানরূপ আকাশাদি পঞ্চ-মহাভূতের পরস্পর সম্মিলন-সামর্থ্য না থাকায় এবং উল্লিখিত ইন্দ্রিয়াদিরও পরস্পর সম্মিলন-সামর্থ্য বা স্থূলরূপে অভিব্যক্তি-সামর্থ্য না থাকায়, সমস্তই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল (শ্রীভা ২।৫।৩২)।

সম্মিলন-নিমিত্ত সংহননশক্তির প্রয়োজন। সাধারণতঃ দেখা যায়, কেবলমাত্র একটি শক্তি যখন কোনও বস্তুর উপর প্রয়োজিত হয়, তখন কেবল একদিকেই তাহার ক্রিয়া চলিতে থাকে; শক্ত্যন্তরের ক্রিয়া ব্যতীত তাহার গতির পরিবর্তন হইতে পারে না। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ প্রথমে প্রকৃতিতে যে শক্তি প্রয়োগ করিলেন, তাহা কেবল এক দিকেই—প্রকৃতির পরিণতির দিকেই—ক্রিয়া করিতে লাগিল; তাহার ফলে প্রকৃতি বিভিন্নরূপ বিকার প্রাপ্ত হইল; কিন্তু ঐ পরিণতি-দায়িনী শক্তি প্রকৃতির বিকার-সমূহের সম্মিলন-দানে সমর্থ্য নহে, তাই পঞ্চভূতাদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। তাহাদের সম্মিলনের জন্য অগ্নি একটি সংহনন-শক্তির (সম্মিলনদায়িনী শক্তির) প্রয়োজন। এই সংহনন-শক্তি যখন ক্রিয়া করিবে, পরিণতি-দায়িনী শক্তির ক্রিয়াও তখন সম্মিলনের পক্ষে অপরিহার্য্য; কারণ, সম্মিলনও পরিণতিরই বৈচিত্রী-বিশেষ। উভয় শক্তিরই যুগপৎ ক্রিয়া দরকার।

সংহনন-শক্তির প্রয়োগ। ভৌতিক হৈম অণু। বহু অণুর সৃষ্টি। বস্তুতঃ কারণার্ণবশায়ী আকাশাদি সমস্ত বস্তুতেই সংহনন-শক্তি সঞ্চার করিলেন (শ্রীভা ৩.২৬।৫০)। তখন উভয় শক্তির যুগপৎ ক্রিয়ায় ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কালকর্ম্মাদির প্রভাবে মহাভূতাদি সম্মিলিত হইতে লাগিল এবং তাহাদের সম্মিলনে একটি ভৌতিক অণুর সৃষ্টি হইল (শ্রীভা ৩.২৭।১৪)। অণু একটি গোলাকার বস্তু। ঘূর্ণন ব্যতীত কোনও তরল বা কোমল বস্তু গোলাকারত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না; আবার কেন্দ্রাভিমুখিনী-শক্তির ক্রিয়া ব্যতীত কোনও বস্তুর ঘূর্ণনও সম্ভব নয়। সংহননশক্তির প্রভাবে মহাভূতাদি সম্মিলিত হইয়া যখন অণুকারে পরিণত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়, তখন ঐ সংহনন-শক্তিটি যে কেন্দ্রাভিমুখিনী শক্তি—অণুর কেন্দ্র হইতেই যে ইহা ক্রিয়া করিতেছে—তাহাও অনুমিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—ঐ অণুটি “হৈম” অণু; হৈম অর্থ হেমবর্ণ—উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়। ইহাও জানা যায়, ঐ অণুটি নাকি বহুকাল যাবৎ সাগর-জলে শয়ান ছিল (শ্রীভা ৩.২৭.১৫)। এই সাগর অধুনা পরিদৃশ্যমান সাগর নহে—তাহা হইতে পারে না; কারণ, তখনও পরিদৃশ্যমান স্থূল জলের সৃষ্টি হয় নাই। বোধ হয় নীহারিকাবৎ কোনও সূক্ষ্ম বাষ্পীয় পদার্থকেই এস্থলে সাগর-জল বলা হইয়া থাকিবে—ইহা তখন সমগ্র অণুকে বেষ্টন করিয়া সর্কাদিকে অবস্থিত ছিল; তেজঃপ্রভাবেই বোধ হয় ইহা তখন জ্যোতির্ময় (হৈম)-রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ভূতাদির সম্মিলনজনিত যে বস্তুটি সংহনন-শক্তির ক্রিয়ায় অণুকারত্ব লাভ করিয়াছে, তাহাও প্রথমতঃ নীহারিকা অথবা নীহারিকারই স্থূলরূপ কোনও বাষ্পীয় বা তরল পদার্থময়ই ছিল; নচেৎ গোলাকারত্ব প্রাপ্ত সম্ভব নহে। ক্রমক্রমে সংহনন-শক্তির ক্রিয়ায় ঘূর্ণন বশতঃ অণুর বহির্ভাগ ক্রমশঃ তরল ও পরে কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে থাকে—অংশবিশেষ মূল অণু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও যাইতে থাকে; এইরূপে আবার অসংখ্য অণুর সৃষ্টি হইতে থাকে। মূল অণুর প্রত্যেক সূক্ষ্ম অংশেও পরিণতি-দায়িনী শক্তি এবং সংহনন-শক্তির ক্রিয়া থাকতে বিচ্ছিন্ন অণু সমূহেও ঐ দুইটি শক্তির ক্রিয়া রহিয়া গেল—তাই তাহারাও অণুকারত্বই প্রাপ্ত হইল। এ সকল

অণ্ডের প্রত্যেকটীতেই পুরুষের শক্তি কেন্দ্রাভিমুখিনী শক্তিরূপে ক্রিয়া করিতে লাগিল। এই কেন্দ্রাভিমুখিনী শক্তির যে অধিষ্ঠাতা, তিনিও কারণার্ণবশায়ীরই একটি স্বরূপ—প্রত্যেক অণ্ডের কেন্দ্রে তাঁহার অধিষ্ঠান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত স্পষ্ট কথায়ই বলিয়াছেন :—“অগণ্য অনন্ত যত অণু সন্নিবেশ। ততরূপে পুরুষ করে সভাতে প্রবেশ ॥ ১৫৫২ ॥ সেই পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া + সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু মূর্তি হঞা ॥ ১৫৭৮ ॥”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আরও বলেন, সেই পুরুষ এক এক রূপে অণু সমূহের—“ভিতরে প্রবেশি দেখে সব অন্ধকার। ১৫৭৯ ॥” তখন তিনি—“নিজ অঙ্গে স্বেদজল করিল সৃজন। সেই জলে কৈল অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ড ভরণ ॥ ১৫৮০ ॥ জলে ভরি অর্দ্ধ তাঁহা কৈল নিজবাস। ১৫৮২ ॥” এজ্ঞ পুরুষের এই স্বরূপকে গর্ভোদশায়ী পুরুষ বলে।

উল্লিখিত পয়ার-সমূহ হইতে বুঝা যায়, অণু-সমূহের অভ্যন্তর-ভাগ জলবৎ তরল পদার্থে পূর্ণ ছিল; ইহা স্বাভাবিক; অভ্যন্তর-ভাগে তাপাধিক্য বশতঃ এইরূপ হইয়া থাকে। ভূতত্ত্ববিদগণ বলেন—পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগ এখনও অত্যধিক তাপময় তরল পদার্থে পরিপূর্ণ।

গর্ভোদকশায়ী। যাহা হউক, কেন্দ্রাভিমুখিনী সংহনন-শক্তির প্রবর্তকরূপে গর্ভোদশায়ী প্রত্যেক অণ্ডের মধ্যে অবস্থান করিলেন; তখনও জীবের ভোগায়তন দেহাদির অর্থাৎ জীবের সৃষ্টি হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—গর্ভোদশায়ী পুরুষ সহস্রাধিকবর্ষ যাবৎ ঐরূপে অবস্থান করার পরে বাষ্টি জীবের সৃষ্টি আরম্ভ হয় (শ্রীভা ৩২০।১৫)। ইহাতেই বুঝা যায়, তাপ-বিকীরণাদি দ্বারা অণ্ডের বহির্ভাগ জীব-বাসের উপযোগী হইতে সুদীর্ঘকালের প্রয়োজন হইয়াছিল।

যাহা হউক, বাষ্টিজীবের সৃষ্টির পূর্বে সর্বপ্রথমে ব্রহ্মার সৃষ্টি হইল—পুরুষ ব্রহ্মাতে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহা-দ্বারা পূর্বসৃষ্ট উপাদানাদির সাহায্যে জীবাদৃষ্টের অল্পকূল ভোগায়তন-দেহ এবং ভোগ্যবস্তু-আদির সৃষ্টি করিলেন—সংহনন-শক্তির ক্রিয়ায় মহাভূতাদিই ঈশ্বরাদিষ্ঠিত কালকর্মের প্রভাবে তত্ত্বরূপে পরিণত হইল; তখন জীবমায়ার প্রভাবে জীব স্বস্ব-অদৃষ্টানুরূপ ভোগায়তন-দেহে প্রবেশ করিয়া সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে রূপ-রসাদি উপভোগ করিতে লাগিল। গর্ভোদশায়ী জীবাস্তর্ঘ্যামী পরমাত্মারূপে প্রত্যেক জীবের মধ্যে থাকিয়া তাহার কর্মফল দান করিতে লাগিলেন।